ভূমিকা

আমার শিকার অভিজ্ঞতার কাহিনী এই পত্রগুলিতে সহজ সরল ভাবে বিবৃত করেছি। 'শিশুকাল হতে' আমি শিকার ভালবাসি, কর্মজীবনের পরিশ্রমের মধ্যেও প্রীতি আমার মন হতে দূর হয়নি। কোন অবসর দিন এ সম্বন্ধে আমার ব্যর্থ যায়নি, বহু কাজের মধ্যে দু-এক প্রহরের ছুটি করেও আমি বেড়িয়ে পড়েছি। শিকার আমার শুধু চিত্ত বিনোদনের উপায় মাত্র নয়, শিক্ষাক্ষেত্রও বটে! এতদ্বারা আমি যে লক্ষ্য করবার ক্ষমতা ও অভিনিবেশ শক্তি অর্জন করেছি তা আমার জীবনযাত্রার পথে বহু বিষয়ে সহায়ক হয়েছে।

এ চিঠিগুলি আমি আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে লিখেছিলাম। আমার বিচিত্র অনুভূতির এই ইতিবৃত্ত তাঁদের মনে শিকার সম্বন্ধে কৌতূহল উদ্রেক করবে, সে আশা পোষণ করি। ঝিল, জঙ্গল, পশুপাখি চিরদিনই আমায় বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট করেছে। যদিও যা কিছু দেখেছি, শুনেছি, অনুভব করেছি সব কথা বলা হয়নি তবুও ভরসা হয় যাঁরা শিকার ভালোবাসেন তাঁদের কাছে এ কাহিনী অপ্রীতিকর হবে না। আর যাঁরা আমার সমবৃত্তি, মৃগয়াপ্রিয় তাঁরাও এ বিবরণ পাঠে কোন কোন বিষয়ে সাহায্য লাভ করবেন, কেননা আমার এই স্বপার্জিত জ্ঞান, বিচিত্র ও বিবিধ, প্রধানতঃ বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশ সকলে ও মধ্যভারতে বহু বৎসর ব্যাপী শিকার-অভিজ্ঞতার ফল।

শিকার ক্ষেত্রে আমি নৈপুণ্য ও সাফল্যের কিঞ্চিৎ যশ অর্জন করেছি। তাই যদি আমার শিকারী বন্ধুদের কাছে এ কাহিনী আদৃত হয়, আমার সন্তানগণ তাদের বৃদ্ধ পিতাকে স্মরণ ও বহুশ্রমলব্ধ মৃগয়া সাফল্যের নিদর্শন চর্মাদি সযত্নে রক্ষা করে, তবেই আমি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করব।

শ্রীকুমদনাথ চৌধুরী দেবশর্মা

অনুবাদকের নিবেদন

আমার শ্রদ্ধেয় মাতুল শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ চৌধুরীর মূল ইংরাজি হইতে এই শিকার কাহিনী মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া তাঁহারি হাতে সমর্পণ করিলাম। এ আমার 'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।' এ কাহিনী বঙ্গীয় পাঠকবর্গের প্রীতিকর হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী

৯ই আগষ্ট ১৯১৭

স্নেহের কল্যাণ,

বর্ষার সময়, বিশেষতঃ ভরা শ্রাবণে, এক একটা বাদলা দিন আসে, যেদিন আকাশ মেঘে ছাওয়া, অনবরত টিপটিপ করে বৃষ্টি ঝরছে, কোথাও কোনওখানে আলোর দেখা পাওয়া যায় না। এমন দিনে সুস্থ সবল মানুষের জীবনও দুর্বহ হয়ে ওঠে। আজ ঠিক তেমনি একটি দিন এসে দেখা দিয়েছে, চারিদিক ভিজে স্যাঁতস্যাঁত করছে, আকাশে মেঘের ভার যে কখনো হালকা হয়ে যাবে, এমন কোন সুদূর লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আজ আমার মনে, কত দিনের কত পুরানো সুখের কথা ভিড় করে আসছে। মানুষ কত কি ভুলে যায়, কিন্তু 'পুরানো সে দিনের কথা' ভোলা হয়ে ওঠে না! দু-বৎসর পরে, আমি বনের মধ্যে বড় বড় বাঘ, ভালুক, হরিণ শিকার করতে নিয়ে গিয়ে তোমায় মৃগয়া ব্রতে দীক্ষিত করব কথা আছে। আমার এই অঙ্গীকার বারবার তুমি আমায় স্মরণ করিয়ে দাও। যখন আমার বয়স নাবালকের গন্ডি পেরোয়নি, সবে সতের কি আঠার, সেই সময় আমি আমার প্রথম চিতা বাঘ শিকার করি। চিতা বলে মনে কর না সেটি ছোট, তার রাক্ষস প্রমাণ শরীর! রামায়ণে দুন্দুভি রাক্ষসের[১] হাড়ের বর্ণনা পড়েছ ত? এই বাঘের চামড়া না নিয়ে, হাড় যদি নেওয়া হত, তাহলে হয়ত তার পরিমাণ দুন্দুভির হাড়কে হার মানাত! একরাস কটাশে রোঁয়া! জন্তুটি এত কাছে এসে পড়েছিল যে অতটা সান্নিধ্য কখনই নিরাপদ নয়। কিন্তু না জানা থাকলে, অনেক ভয়ানক জিনিসও ভয় দেখাতে পারে না। ভাগ্যে তাক ঠিক ছিল, এক গুলিতেই ফরসা! তারপর তার পিছন পিছন দৌড় দিলাম। আহত বন্য জন্তুকে এমনভাবে তাড়া করে যাওয়া, শিকারের সব আইনের বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ এদের চালচলন সবই যখন আমার অজানা। 'সব ভাল যার শেষ ভাল,' জয়ী আমিই হলাম। আজ এই বিশ্রী বর্ষার দিনে, ঘরে বসে বসে সেদিনের পাগলামির কথা নূতন করে মনে পড়ছে। সেদিনের সেই অপূর্ব আনন্দ, আজকার সব প্রতিকূলতার মধ্যেও উজ্জ্বল মূর্তিতে এসে দেখা দিয়েছে, শুধু সে একা আসেনি, অনেক সাক্ষীও সঙ্গে এনেছে। নিজের শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে, বড় বড় জানোয়ার বা কিছু শিকার করেছি, তা পায়ে হেঁটেই করেছি। এতে বিপদের খুবই সম্ভাবনা, তবু আমি জোর করে বলতে পারি এই পন্থাই সবচেয়ে নিরাপদ।

যদি এদের ধরণধারণ, মেজাজ ও খেয়াল সম্বন্ধে তোমার যদি কোন ধারণা না থাকে, যদি এদের পিছু পিছু খুঁজতে যাবার, পায়ের দাগ দেখে খুঁজে বার করবার কায়দা কিছু না জান, কিম্বা কষ্ট স্বীকার করে এ বিদ্যা আয়ত্ত না করে থাক, তাহলে সুবিধার চেয়ে বিভ্রাট ঘটবারই সম্ভাবনা বেশী। তবে এ বিদ্যা বই পড়ে পাওয়া যায় না, হাতে বন্দুকে বল্লমে শিখতে হয়। তা যদি শিখতে পার আর এ পথে চলবার জন্যে একজন যোগ্য সঙ্গী আর উপদেশ দেবার লোক পাও, তাহলে দেখবে, মৃগয়া তোমার ব্যসন না হয়ে আনন্দের উপকরণ হবে। শিকারের খেয়াল বজায় রাখতে গিয়ে দুঃখে পড়বে না। এ বিষয়ে তোমায় অনেক কলাকৌশল শিখিয়ে দিতে পারব। চারিদিকের সব অবস্থার উপর তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকলে, চর্চার ফলে সহজে সে শক্তি যে আরো বাড়ে তাতে আর সন্দেহ কি? আজকালকার দিনে ছেলেদের যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে তাদের অনেক বিধিদত্ত শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক বরং অবনতি হয়। এই কথা মনে করেই, আমি সর্বদা তোমার মনে যেসব জীব, জন্তু, পাখি দেখতে পাও, তাদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়ে রাখবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করে আসছি। তুমি আর ছোট্ট অলকা (যদিও তুমি মনে কর এক্ষেত্রে মেয়েদের কোন অধিকার নাই) অনেকবার হাতির উপর চড়ে স্নাইপ[২] (Snipe) শিকার দেখেছ। যখনই ডিঙিখানা বিলের পদ্ম আর শরবনের উপর দিয়ে নিঃশব্দে সরে চলেছে, পাখিটি উড়েছে, আমি মারতে যাচ্ছি, অমনি ছেলেবয়সের অদম্য উৎসাহে, চীৎকার করে, হাততালি দিয়ে, সেটিকে উড়িয়ে দিয়েছ। তবু তোমরা এখন জান, স্নাইপ (কাদাখোঁচা) কত অল্প সময়ের জন্য বাঙলাদেশে বেড়াতে আসে। তাদের লম্বা ঠোঁটের পাশে, চোখের চেয়ে কান যেখানটিতে থাকে, সেই সংস্থানের বিশেষ সার্থকতা আছে। কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার পর থেকে, আমার কথা ঠিক কি না, বারবার তার পরখ করে নিয়েছ। আমি যতদূর জানি বুনো মোরগ কাদাখোঁচা ছাড়া আর একমাত্র পাখি, যার এই বিশেষত্ব আছে। এ তত্ত্ব তোমাদের এখনও জানতে বাকী আছে। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের চেয়ে চাঁদনী রাত এদের বেশী পছন্দ। তাই বোধহয় শীগগিরই এসে পৌঁছুবে। তোমরা সহজেই তাদের চিনতে পারবে। তাদের মধ্যে যার ছুঁচের মতো লেজ আর যার পাখার মতো লেজ, সে প্রভেদ বুঝতে তোমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না! তোমাদের কাঁচা বয়সের ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখে, এ প্রভেদ অনায়াসেই ধরা পড়বে। একজন প্রবীণ চিত্রকর কিন্তু সেটি আবিষ্কার করতে পারেননি। স্বামী-স্ত্রীকে এক চেহারা দিয়েছেন, কিন্তু তাও কি

কখনো হয়? আর এক কথা। এই পাখির বড় কানের মধ্যে এমন ভাব যে একেবারে মানিকজোড়! পুরুষ ধরা পড়লে মেয়েটিও ধরা দেয়! কাজেই আমি যখন শিকারে যাব, তখন তোমরা দুই ভাইবোন দুটি পেতে পারবে। এদের সংখ্যা বেশী নয়, আর আমার বংশবৃদ্ধির অনুপাতে, তাদের নম্বর ঠিক রেখে গ্রেপ্তার করে আনবার সাধ্য আমার হচ্ছে না। তাই এবারে প্রথম যেটি ধরা পড়বে, সেটি আমাদের বাড়ির ছোট্ট লাটসাহেব ওরফে কালীবাবুকে নজর দিতে হবে। তা না হলে তিনি নিশ্চয়ই মানহানির দাবীতে মহারানির দরবারে নালিশ রুজু করবেন। তখন আমার অবস্থা কি যে হবে, তা তোমরা বেশ আন্দাজ করতে পারছ।

স্নাইপ আর স্নাইপ শিকারের কথা এখন বেশী বলব না। আমাদের হরিপুরের পৈতৃক বাড়ির আঙ্গিনা হতে অনেক সন্ধ্যায় তোমরা চিতাবাঘের করাত চালার মতো আওয়াজ শুনেছ, আর যতদিন না আমার গুলি লেগে সে মরেছে, ততদিন আর সে শব্দের বিরাম হয়নি। তোমরা হয়ত দেখেছ, আমি যখন শিকার করতে যাই, তখন আমার বসবার টুলের সম্মুখে পাতায় ভরা ডালপালা দিয়ে একটা আড়াল করে নিই। সে আড়ালটা যথেষ্ট ঘন কিম্বা মজবুত নয়, তবু নিজেকে লুকিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। তোমরা মোহনলাল[৩] হাতিতে বাঘের যাওয়া আসার গলিপথ আবিষ্কার করে ফিরিবার আগেই কতবার হয়তো বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছ, তারপর তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে দেখেছ, মস্ত একটা চিতাবাঘ ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে, গুলি একেবারে তার গলার নলি ফুঁড়ে বেড়িয়ে গিয়েছে। আমাকে শিকার করাই ছিল তার মতলব, কিন্তু কপালে লেখা ছিল অন্যরকম, তাই তার মনের সাধ পেরোবার আগেই সে লুটিয়ে পড়ল, আর যমরাজা তার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। জানত যমের বাহন মহিষ। জীবন্ত থাকলে ব্যাঘ্রবীর মহিষটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পিছপা হত না বোধ হয়। যাই হোক তৃতীয় পান্ডব অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ করবার শক্তি আমার ছিল, তাই যমরাজার সুবিধা হয়ে গেল, তা না হলে বাহনটা মারা গেলে ভদ্রলোকের চলাফেরার মুস্কিল হত।

হরিপুরের[৪] চারিদিকেই বুনোশুয়ারের বসতি। পাবনার বুনোশুয়োর তার বিপুল বপুর জন্যে বিখ্যাত। চতুর চিতা এদের লোভে চারিদিকে ফেরে, আর সুবিধা পেলেই অসহায় বরাহশিশুদের হত্যা করে উদর পুরিয়ে দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। বনের ভিতরে যেসব সুঁড়িপথ দিয়ে জানোয়ার আনাগোনা করে, তা খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। তাড়া খেয়ে কোথায় গিয়ে তারা আশ্রয় নেবে, সেটাও অনুমান করা সহজ। আমি তোমাকে এ বিষয়ে আজ যা বলে দেব,

তাতে কাল তোমার জ্ঞানলাভের সুযোগ হতে পারে। আর তার প্রসাদে পায়ে হেঁটে নির্বিঘ্নে তুমি বেশ শিকার করতে পারবে। আমরা যে শুনতে পাই শিকার করতে গিয়ে অমুক লোকটা হঠাৎ মারা গিয়েছে, কিম্বা ঘায়েল হয়েছে, এসব অনর্থ কিন্তু অকারণে ঘটে না, দৈবাৎ ত নয়ই, মূলে থাকে অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা কিম্বা দুঃসাহসিকতা, চলতি কোথায় যাকে বলে বোকামি আর গোঁয়ার্তুমি।

মৃগয়া শুধু খেলা নয়, এর মধ্যে বিপদও অনেক। তাই সাহস আর বুদ্ধি দুইয়েরি বিশেষ দরকার! তা না হলে এ খেলার কোন আমোদই থাকত না!

সে খেলার দাম, নয় কানাকড়ি,
হুসিয়ার জোয়ানের কাছে,
নাই যাতে ভয়, নাই লড়ালড়ি,
বিপদ সঙ্গীন ছোটেনা পাছে!

আমি তোমাকে এখন যেসব চিঠি লিখছি, তাইতে তুমি প্রথম যেদিন বন্দুক হাতে শিকারক্ষেত্রে নামবে, সেদিন অনেক দরকারী জিনিস তোমার জানা থাকবে, অন্ততঃ থাকা উচিত। আর তুমি যদি পাকা হুসিয়ার শিকারী হতে না পার, তার জন্যে আমি দায়ি হব না। শুধু পশু-পাখির প্রাণ হানি করবার ক্ষমতা দক্ষ শিকারীর পরিচয় নয়। ইংরাজিতে যাকে Gentleman বলে তার ঠিক প্রতিশব্দটি আমাদের বাংলা ভাষায় খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, তবু কথায় না বলতে পারলেও ভাবটি যে কি তা আমরা সবাই বুঝি। আমার মতে যে লোক জীবনের সব ব্যাপারেই যথার্থ Gentleman, সেই ঠিক চৌকোষ শিকারী (Sportsman)। জীবনটা ত সহজ ব্যাপার নয়! বিশেষ করে আমাদের ভারতবাসীদের জীবন, আশেপাশে চারিদিকেই কত বাধা বিপত্তি। শিকার করতে গিয়েও দেখবে, কত ঈর্ষা, বিদ্বেষ, কত ক্ষুদ্রতা, কত দলাদলি, সহজ ভদ্রতা বিরোধী কত হীন ব্যবহার, এক কথায় বলতে গেলে কত অভদ্রতা!

তোমার বয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে, তোমার মতো মহাভারত কথা কেউ ভাল করে জানে না। তোমার বয়সের কেন, কোন বয়সের ছেলেই জানে কি না সন্দেহ। তাই তুমি জীবনে কীভাবে চলতে পারবে, সে বিষয় আমার মনে বিশেষ কোন দ্বিধা নেই। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, তার অর্থ তোমার মনে ভাল করে বসিয়ে দিতে চাই। সে হচ্ছে ক্রিকেট খেলা (Sports), অর্থাৎ ভাল খেলোয়ার হওয়া চাই। চেনা ব্রাহ্মণের যেমন পৈতা

দরকার হয় না, তেমনি ভাল খেলোয়ার, হাতিয়ারের পরোয়া রাখে না। সব হাতিয়ারই তার হাতে চলে ভাল। এই যে জার্মান-ইংরেজে যুদ্ধ[৫] হচ্ছে, এতে খুব ভালো করেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে ভালো Sportsman-রাই সবচেয়ে ভাল যোদ্ধা। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তারা যে বীরত্ব, সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে তার অনেকগুণই তারা মৃগয়া ক্ষেত্রে অর্জন করেছিল, এই বিপুল সমরাভিনয়ের নান্দীপাঠ[৬] প্রথম অঙ্কে মৃগয়াতেই হয়েছিল। ফুটবলের হুড়োহুড়িতেও তুমি খুব মজবুত তা আমি দেখেছি, ক্রিকেট খেলাতেও বেশ সতর্ক। এই দুই খেলাতেই লক্ষ্য ঠিক রাখবার ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, কৌশল ও কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ে, শরীর সবল, অস্থিমজ্জা-পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠে। পুরুষের যা পৌরুষ তারি সূচনা হয়। ইংরেজ বাচ্চার মধ্যে এই যে খেলার উৎসাহ, আগ্রহ আর একাগ্রতা আছে, তাই পরে তাকে জীবনের ঝড় ঝাপটায় তরিয়ে দেয়, আর যুদ্ধের এই সঙ্গীন বিপদের মধ্যেও খাড়া রেখেছে। এই নৈপুণ্য, সাবধানতা, ব্যায়ামচর্চার ফলে দৈহিক উৎকর্ষ, আজকার সংগ্রামের ভীষণ পরীক্ষায়, বিশ্ববিদ্যালয় আর স্কুলের ছাত্রদের যে কতবড় আর কেমন অটল সহায় হয়েছে, তা আর আমি তোমায় কি বলব! বৃহত্তর জীবনসংগ্রামেও এই সুকৃতির ভাইটিকে বোঝাতে চাই যে রাজার আর স্বদেশের সম্মান রক্ষার জন্যে যদি যুদ্ধ করতে চাও, তাহলে সে মহৎ কর্তব্যের আরম্ভ করতে হবে এই খেলার আখড়ায়, শৈশবের এই খেলাঘরে! একদিন আমার জীবনেও এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ছিল, বৎসরের পর বৎসর চলে গেল, কামনা আর কর্মে পরিণত হল না, এখন সে স্বপ্ন আর আমার আশার রাজ্যে নেই, ক্রমশঃ স্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে আসছে। তবে তোমরা আমার জীবনে এসেছ, তাই আশা আবার দেখে দিয়েছে, আমাকে দিয়ে যা হয়নি, তোমরা তা করবে। যতক্ষণ না অনুভব করবে তোমারই দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়তার উপর দেশের কল্যাণ নির্ভর করছে, যতক্ষণ না তুমি জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে, এই বিশাল রাজ্যের অন্যান্য প্রজাদের সঙ্গে পাশাপাশি সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পার, ততক্ষণ যথার্থ স্বদেশভক্তি তোমার মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে না। তোমাদের এই শক্তিতে প্রাণবান আর এই যোগ্যতার অধিকারী হতে দেখাই এখন আমার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষা। তাই আমি চাই সংসারের এই রঙ্গভূমিতে সব রকমে তোমরা হুশিয়ার খেলোয়ার আর মজবুত পালোয়ান হও।

বন্দুকে বল্লমে তীরে তলোয়ারে
লাঠি, বড়শিতে আর

করোগো শিকার, করোগো শিকার
হও হুশিয়ার হও হুশিয়ার।
সাবাস জোয়ান, মুস্কিল আসান,
করে নেবে ফতে কেল্লা দুনিয়ার!
বেড়ে যাবে ছাতি, বাড়িবে ভরসা
নিদাঘ হেমন্ত, দুরন্ত বর্ষা,
কি করিতে পারে কার?
ভালো খেলোয়াড় ভালো পালোয়ান
তারা যে মানুষ ভালো,
বাহির ভিতর সমান তাদের
কোথাও নাহিক কালো।
ভীরু যারা সব, নাকে কাঁদে শুধু
হাঁচি টিকটিকিতে ডরে,
তাদেরি পরানে পাপের বসতি,
দেহে মনে ঘুণ ধরে!
পছন্দ সবার নয়তো সমান
ঝগড়া চলে না তায়,
তাস-পাশা নিয়ে কারো কাটে দিন
কেহবা সমরে ধায়!
তবু যদি ভাই শিকার সবাই
করিলে করিতে বেশ,
জাল জুয়াচুরি চুরি বাটপাড়ি
ইহাতে নাহি কো লেশ!
বন্দুক বল্লমে তীরে তলোয়ারে
লাঠি সড়কিতে আর
করগো শিকার করগো শিকার
হও হুশিয়ার হও হুশিয়ার।
সাবাস জোয়ান, কিসের পরোয়া
করে নেবে ফতে কেল্লা দুনিয়ার!

এ চিঠি শেষ করবার আগে তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। বসুন্ধরা তাঁর প্রকৃতির যে সুন্দর বইখানি আমাদের চোখের সম্মুখে দিন-রাত খুলে

রেখে দিয়েছেন, এরচেয়ে ভালো পড়বার বই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পড়ে শেষও করা যায় না, রোজই নতুন কথা লিখছেন, একঘেয়ে হয় না বলেই বুঝি এমন ভালো লাগে। বৈজ্ঞানিক তাঁর ঘরের কোণে ঘুপসি হয়ে বসে, আপন খেয়াল মতো চলেন। অনেক সময় ভুল করে, চশমাটা যে চোখে পরবার নয়, তাতেই লাগান। তাই যা সত্যি তা তাঁর সম্মুখে ভিন্ন মূর্তিতে দেখা দেয়। তিনি যা হওয়া উচিত মনে করেন তার উল্টো কিছু দেখলে তাঁর মন বিরূপ হয়ে ওঠে। আর মাঠে বনে যাঁরা প্রকৃতির তত্ত্ব নিয়ে ফেরেন, তারাই কিন্তু ঠিক খবর পান। সতর্কদৃষ্টি হয়ে দেখতে শিখো, আর যা দেখলে তা মনে করে রেখো। সেসব জন্তু শিকার করা হয়, শুধু তাদেরই রীতি- চরিত নয়, সব জন্তুরই অভ্যাস-ব্যবহার ভারি আশ্চর্য। পাখিদের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। যখন শিকারের খবর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, বসে বসে দিন আর কাটে না, তখন যদি চারিদিকের অপরাপর জন্তুদের চলাফেরা লক্ষ্য করবার অভ্যাস তোমার থাকে, তাহলে থিয়েটার দেখতে দেখতে মানুষের যেমন সময়ের জ্ঞান থাকে না, তেমনি তোমারও দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেল, বুঝতেও পারবে না।

কৃষিকাজ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বনজঙ্গল যত কাটা পড়ে যাচ্ছে, শিকারও তেমনি অল্প হয়ে আসছে। যেসব সুবিধা আমরা পেয়েছি সে সুযোগ তোমরা খুব সম্ভবতঃ পাবে না। খালবিল শুকিয়ে আসছে, নদীর ধারার সে প্রবল স্রোত আর নেই। এর প্রধান কারণ দেশের বড় বন কাটা পড়ে মাঠে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে বেশী জোর করে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই। তবে শিকার যে কমে আসছে, সেটা এমন প্রত্যক্ষ সত্য যে, তাও অস্বীকার করবার জো নেই। যেসব দেশে আগে বুনো মোষ আর হরিণ দলে দলে চলে বেড়াত, এখন আর তাদের সেখানে দেখা যায় না। তারা অন্যত্র চলে গেছে, তাদের খোঁজে খোঁজে বাঘ-ভালুকও দেশান্তরী হয়েছে। সেইজন্যে তোমাকেও হয় তো অনেক দূর-দেশে যেতে হবে। তবে যাত্রা যে নিষ্ফল হবে এমন কথা বলা যায় না। যা চাও তা পাবার জন্যে বহু ধৈর্য্যের আবশ্যক। জীব-জন্তুর জীবনচরিত সম্বন্ধে একটু জ্ঞান সঞ্চয় করে নিয়ো। খাল, বিল, নদী, নালা, মাঠ, বন, পাহাড়, পর্বত, মানুষের মন ভোলাবার অনেক ফন্দী জানে, এত আনন্দ দিতে পারে যা জীবনেও ফুরোয় না। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবে। এই যে পশু-পাখির গায়ের রঙ, এ যে কেন এমন, এ রহস্য ভেদ করবার আগে অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয়, অনেকখানি ধৈর্য্যের আবশ্যক। সূর্য্যের আলো বনের রাশি রাশি পাতার মধ্য দিয়ে গোল হয়ে আসে, আর যেখানে

গাছপালা ছাড়া ছাড়া, পাতার মধ্যে অনেকখানি করে ফাঁক, সেখানে লম্বা হয়ে পড়ে। এইজন্য চিতার গায়ে গুল বসানো, আর বাঘের গায়ে ডোরাকাটা। একজন থাকেন গভীর বনে, আর একজন বনের ধারে। এমনি পোষাক পরেন বলেই অলক্ষ্যে শিকারের উপর গিয়ে পড়তে পারেন। তৃণজীবী জন্তুদের গায়ের রং তাদের বাসস্থানের সঙ্গে এমনি মিশ খায় এবং তাদের পর্দার মতো আড়াল করে ঢেকে রাখে যে, শত্রুর চোখ সহসা সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু এটা কি একেবারে বাঁধা নিয়ম, এর আর নড়চড় হয় না? হয় বৈকি। বহু শত্রুবেষ্টিত একই জায়গায় হয়তো ঝলমলে পোষাকপরা অনেক পশু-পাখি দেখা যায়, যাদের রং দূর হতেই চোখে পড়ে। ঋতু-পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে পশু-পাখির গায়ের স্বাভাবিক রং আবার বদলাতেও দেখা যায়। যে-দেশে শত্রু সংখ্যা কম, সেখানে তাদের সাজ-পোষাকের জাঁকজমক বেড়ে ওঠে। যেমন আজকাল যুদ্ধের দিনে খাকি পরা হয়েছে কিন্তু শান্তির দিনে সেপাইরা রক্তের মতো রাঙা পোষাক পরে বেড়াত। দেশভেদে আর বিয়ের মতলবেও পশু-পাখিরা রং বদলায়। যেমন বুড়ো বর গোঁফে-চুলে কলপ দিয়ে কাঁচা ছেলে সেজে মন ভোলাতে চায়, তেমনি আর কি! আমি তোমাকে গোড়ার কথা দু-একটা বলে দিতে পারি, এগোতে হলে সাবধান হয়ে দেখতে হবে, সতর্ক হয়ে বিচার করা চাই, তবে তো কিন্তু প্রকৃতির গূঢ় রহস্য ভেদ করতে পারা যায়?

কলিকাতা, ২০শে আগষ্ট ১৯১৭

স্নেহের অলকা কল্যাণ,

শিকারের রাজ্যে ব্যাঘ্রবীরকেই সম্মানের প্রথম পদ দেওয়া উচিত। তিনিই এ রাজ্যের অধিনায়ক। যদিও এ রাজকীয় জাতির সংখ্যা তত অধিক নয়, তবুও আমাদের বিশাল অরণ্য প্রদেশ সকলে তাদের নির্বংশ হবার সম্ভাবনা খুবই কম। অনেকে মনে করেন শ্বাপদ জাতির বংশক্ষয়ের জন্যে শিকারীরাই দায়ী। এ কথা আফ্রিকা আর আমেরিকার সম্বন্ধে হয়ত বা সত্য। চতুষ্পদ রাজ্যের সাধারণ প্রজাবর্গের যেমন হরিণ-মহিষের সংখ্যা আমাদের দেশে এতই হ্রাস হয়ে গিয়েছে যে সেটা একটা ভাবনারই বিষয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি মৃগয়ার নিয়ম মেনে চলে, আর যথার্থ যার এ সম্বন্ধে অনুরাগ আছে, সে কখনও নির্বিকারে জীবহত্যা করে না। যাদের সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে, তারা প্রায়ই প্রলয় জোয়ান। আর যাতে অধিক সংখ্যা মৃত্যুমুখে পতিত না হয় সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখে। কিন্তু শিকার যাঁদের ব্যবসার আর জীবিকা উপার্জনের উপায় তারাই কোন নিয়ম গ্রাহ্য করে না, জীবহত্যাকান্ডে সংখ্যা নিয়মিত করবার চেষ্টা তাদের আদৌ নাই। এই অত্যাচার রহিত করবার জন্যে অনেক বিধিবিধান প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে আরও সতর্ক সাবধান হওয়া আবশ্যক। তা না হলে আমরা যে সকল দৃশ্য আর যে আনন্দ উপভোগ করে গেলাম, আমাদের বংশধরদের ভাগ্যে আর তা ঘটবে না। বহু বৎসর পূর্বে কটক জিলায়, এখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি, এক একটা শিকার যাত্রায় প্রায় তিনশত অনুচর সহযাত্রী হত! এর মধ্যে আবার অনেকে সেকেলে ধরনের বন্দুক ঘাড়ে আসত। দিনের শেষে আমরা যখন তাম্বুতে ফিরতাম তখন এই অনুচরগণ সবাই প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে দেখলে আমরা আপনাদের ভাগ্যবান বলে জ্ঞান করতাম। এরা এক একজন ত্রিশ ত্রিশ গজ তফাতে বন্দুক ঘাড়ে জঙ্গল ঘিরে খাড়া হয়ে যেত। যে হতভাগারা উত্তরাধিকার স্বত্বে কিম্বা পয়সার জোরে এমন সব দানব অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারেনি, তারা গিয়ে পাহাড়ের মাথার উপর চড়ত, আর সেখান হতে মহাদেবের ভূত-প্রেতের মতো অমানুষিক শব্দ করে, ঢিল-পাটকেল, বড় পাথরের চাঙড় ছুঁড়ে গড়িয়ে শিকার খেদিয়ে এক জায়গায় জড় করবার চেষ্টা করত। কিন্তু চেষ্টার ফল কিছুই হত না। ময়ূর, চিকারা হরিণ, শূকরছানা, সজারু যেই পাশ দিয়ে যাক না কেন,

অমনি এঁরা সেই সেকেলে বন্দুকগুলো ছুঁড়ত। যদিও বেশী কোন বিপদ ঘটতে আমি এ পর্যন্ত দেখিনি, সে কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষের পুণ্যের জোরে। মরতে মরতে অনেকে কোনরূপে বেঁচে এসেছে। তবে বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে এ অবস্থায় বিপদ ঘটাই নিয়ম, আর ঘরের ছেলে নিরাপদ ঘরে ফিরে আসাটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম। বেশ বোঝা যায়, এইসব বুনো লোক, যারা জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি খুব ভালো করেই জানে, তারা যে সময়ে নির্বিচারে অনেক জীবহত্যা করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কারণেই ভারতবর্ষের অরণ্যপ্রদেশে আরণ্যজন্তুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হয়ে যাচ্ছে। যে প্রধান শিকারী আমার মৃগয়া ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে নিযুক্ত হয়েছিল, সেও দেখলাম এ প্রলোভন এড়াতে পারলে না। যেদিন আমি পৌঁছেছি সেইদিন সকালে সে এ মৃগয়ারীতি বিরুদ্ধ কাজটি করলে। ভাল করে ভোর হবার আগেই বনের পথে সে বাঘের পায়ের দাগ খুঁজতে গিয়েছিল। কথা ছিল খোঁজখবর করে ব্যাঘ্রবীর কোথায় শিবির স্থাপন করেছেন তার সংবাদ নিয়ে আসবে। একটা মহুয়া গাছের ছায়ায়, ঝোপের আড়ালে শিকারীর সেকেলে বন্দুকটি, একখানি গামছা, রক্তের জুলি, আর তার থেতলানো অর্ধেক খাওয়া শরীরটা পাওয়া গেল! পরে আমরা জানলাম, এ ভীষণ হত্যাকান্ড, একটি মানুষ-খাওয়া বাঘিনী আর তার তরুণ বংশধরেরা করেছে। খুব সম্ভবতঃ শিকারী একটি চিত্তলের, অর্থাৎ গুলবাহার (Spotted deer) হরিণের আশায় সেইখানটিতে লুকিয়ে বসেছিল। মতলব যদি দেখা হয় তবে সেটিকে মেরে আনবে। ইতিমধ্যে বাঘিনী এসে তাকেই শিকার করে ফেললে। সে অঞ্চলে যতগুলি বাঘ ও বাঘিনী এসে বসত করেছিল, তারা সবাই মহামাংসের[৭] পক্ষপাতী। মৃগমাংসেও তাদের অরুচি ছিল না। কাজেই মানুষটিকে আগে পেয়ে তাকে আর ছেড়ে কথা কইল না। এসব শিকারীরা যেমন নির্বিচারে বনরাজ্যে জীবহিংসা করে বেড়ায়, মনে হয় বনের অধিষ্টাত্রী দেবতা এর প্রাণ নিয়ে তারই প্রতিশোধ তুললেন। নরমাংস আর মৃগমাংস লোভী বাঘেদের কথা বলতে গেলে বলা উচিত, তারা ভিন্ন গোত্রীয় হলেও এক জাতীয়। তাদের বিপুল শরীর দৈর্ঘ্যে দশ ফুটের কিছু উপর (রোলান্ড সাহেবের পরিমাণ রীতি অনুসারে)। শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতা তাদের নামকরণ করেছেন, 'বাঙলার ব্যাঘ্ররাজ'! বঙ্গভূমির জলবাতাসের গুণে তাদের বরবপু শুধু দৈর্ঘ্যে নয়, আয়তনেও বৃদ্ধি পায়। তাই তারা দেখতে সহরের কাঙ্গাল কেরানিদের মতো নয়। মফঃস্বলের মহিমান্বিত জমিদার ও রাজা রাজড়ার মতো, মেদমাংসবহুল। চালচলনও বিশেষ গম্ভীর রকমের। কিন্তু যেসব বাঘ শিকারের

সন্ধানে শুধু মাঠে বনে নয়, পাহাড়ে আর পাহাড়তলীতে চলাফেরা করে, তাদের দেহ ক্ষিপ্রগতি-রাজপুত বীরের মতো দীর্ঘকায়, বসামাংসবজ্জিত, অস্থিমজ্জার সাম্যে দেখতে সুঠাম, সুন্দর। তারা চতুর সতর্ক, দ্রুতগতি, সহসা তাদের শিকার করা কঠিন। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় ফাল্গুন-চৈত্রে কিম্বা তার কিছু পূর্বেই যখন নদীতীর আর বনভূমি মরকতশ্যামল তৃণে[৮] সুসজ্জিত হয়, বাথানের মহিষের দল সেখানে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করে দিব্য হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তাদের শিকার করে করে ব্যাঘ্র বীরেরাও শীঘ্রই 'ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু মহাভুজ'[৯] হয়ে ওঠে। তখন তাদের দিগ্বিজয়ী অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রঘুরাজ বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। পাহাড়ের দেশে ব্যাঘ্রের ভাগ্যে পশুলাভ সহজ ব্যাপার নয়, অনেক পরিশ্রমই করতে হয়, হরিণ, শূকর ভারি চতুর, পারতপক্ষে ধরা দেয় না। দিন গুজরান করতে মেহনত দরকার। তাই প্রাণধারণ শুধু চলে, ভুঁড়িটি গড়ে তোলা আর হয়ে ওঠে না। কাজেই নতুন কার্য্যক্ষেত্র খুঁজে নিতে হয়। এদের সম্বন্ধে যা বললাম চিতা ও নেকড়েদের বিষয়ও সেই কথা বলা চলে। এই রকম ব্যাঘ্ররাজদম্পতি যেখানে রাজত্ব করে সেখানে অন্য কেউ আর অনধিকারচর্চা করতে আসে না, তারা ভিন্ন রাজ্য অধিকারের চেষ্টায় দূরে যায়। এছাড়া আরও এক কারণ আছে। যে রাজ্যে কোন এক ব্যাঘ্রদম্পতি অধিকার করে থাকে, সেখানকার পশুপ্রজা আত্মরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হয়ে ওঠে। কাজেই সেখানে মৃগয়ার সুবিধা বড় একটা ঘটে ওঠে না। সেখানে থাকলে রাজার যুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু উলুখড়ের প্রাণ যায় না, পেটও ভরে না। তাই স্বার্থ সাধন করবার জন্যে স্বতন্ত্র দেশই শ্রেয়ঃ। এছাড়া দেশ বিশেষে এইসব জন্তু বাস করতে একটু ভালবাসে। তোমাদের মনে আছে বোধ হয়, আমাদের হরিপুরের কাছাকাছি জঙ্গলে তিন তিনটা চিতা তিন মাসের মধ্যে উপরি উপরি আমার গুলিতে মারা পড়েছিল।

এদের স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ আয়তনে এবং চতুরতায়। মেয়েরা চালাক বেশী। এমনি করে বোধ হয় তারা গায়ের জোরের অভাবটা পুষিয়ে নেয়। তা নইলে স্ত্রী জাতিকে খাট করে কোন কথা বলি, এমন সাধ্যি আমার নেই। অলকমনি! তোমার এ বিষয়ে ভীত হবার কিছু নেই। না হয় তোমার পতি দেবতাকে এইটুকু পড়ে শুনিয়ো না, তাহলেই কোন গোল হবে না। সন্তান পালন আর রক্ষণের জন্যেও বাঘিনীকে অনেক সময় বেশী সতর্ক হতে হয়। কেননা বাপেদের গ্রাস হতে তার পেটের ছেলেদের রক্ষা করবার জন্যে অনেক বুদ্ধি খরচ, অনেক ফন্দী আঁটা দরকার হয়। শুধু তাই নয়, এই সময়ে তার ছেলেদের আর আপনার ভরণ পোষণের ভার নিজেকে না নিলে চলে না। যিনি

জন্মদাতা তিনি কিছুই করেন না, বরং উল্টে ছেলেগুলিকে কেমন করে মারবেন সেই মতলবে ফেরেন। ছেলেগুলি কিছু বড়সড় হয়ে যখন আত্মরক্ষা করতে পারে, তখনই তাদের মায়ের ভাবনা যায়। তোমরা সবাই জান বোধ হয় বেড়ালের মতো বাঘেরাও সুবিধা পেলেই ছানাদের খেয়ে ফেলে। তাই মাতারা অনাহারে অনিদ্রায় রাতদিন প্রাণপণ করে পাহারা দিয়ে থাকে। একবার আমি মস্ত একটা বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম। কিছুতেই আর নাগাল পাইনে। তারপর সাবালক পুত্রহত্যা পাপের বমাল সাক্ষীতেই সে বাধা পড়ল। গ্রামের কোন লোক একদিন ভোর হবার কিছু আগেই তার বাড়ির কাছে বাঘের ডাক শুনে জেগে ওঠে। তার বাড়িখানি গ্রামের একটেরে, বনের কাছাকাছি ছিল। শেষ রাতে উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে সে দেখলে দুটি মস্ত চিতা মাঠের উপর খেলা করছে। হঠাৎ ভয়ানক গর্জন শুনতে পেয়ে বেরিয়ে দেখে কি দুয়ের মধ্যে যে বয়সে বড়, আকারে আয়তনে বোঝা গেল সে পুরুষ, অন্যটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর কুকুরে যেমন ইঁদুরকে নাকড়ানি দিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনি তাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বেচারী জলে ভরা একটা নালার মধ্যে গিয়ে পড়ল। করুণাময় পিতা আর তার খোঁজখবর নেওয়ার দরকার বোধ করলেন না, সে পড়েই রইল। এ খবর রাত্র ভোর আমার কাছে পৌঁছল। কাজেই এরপরে তাকে খুঁজে বার করা আমার পক্ষে কিছুই কঠিন হল না। এই ক-দিন ধরে ব্যাঘ্র বীরের তল্লাশে আমাকে ভারি হয়রান হতে হয়েছিল, কিন্তু বাচ্ছাটি মায়ের কাছে একটুখানি আদরের চেষ্টায় গিয়েছিল। বাবা মশায়ের বুকে আর সেটুকু সইল না, পুরুষ ব্যাঘ্র ভালবাসার স্থলে কারো আধিপত্য সইতে পারে না, এমন কি নিজের পুত্রেরও নয়!

তোমরা মনে কর না বাঘ কিম্বা চিতা জলের ঘেঁষ নিতে চায় না, সচরাচর তারা জলে পা দিতে চায় না সত্যি, তবে দরকার হলে স্রোতে গা ভাসাতে আপত্তি কিম্বা অনিচ্ছা দেখায় না। আমার বন্ধুবর্গ, যাঁদের সকলেরি তোমরা বিশেষ পরিচিত, আমায় বলেছেন আসামে, শ্রীহট্টে, বাঘ শিকারের সময় তাঁরা দেখেছেন এরা সাঁতার দিয়ে বড় বড় খাল-বিল বেশ পার হয়ে যায়। একবার একটা বাঘ দেখে তার অনুসরণ করে যেতে হঠাৎ দেখলেন সে যেন ধোঁয়ার মতো কোথায় মিলিয়ে গেল। তার আর চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। সম্মুখে খর্ব ঘাসে ঢাকা মাঠ, তার চারিদিকে হাতির উপর শিকারী। এর মধ্যে কোন জাদুতে এমন অসাধ্য সাধন ঘটল, কারো বোধগম্যই হল না। ক্রমে আবিষ্কার হল মাঠের একধারে একটি খাল, বাঘটি টুপ করে তারি জলে নেমে শুধু মাথাটি জলের উপর ভাসিয়ে রেখে, কিনারার একটি বনঝাউ গাছ মরিয়া হয়ে

আঁকড়ে ধরে আছে! সেই অবস্থাতে সে মহারাজা...র গুলিতে মারা পড়ল।

একবার একটা বাঘ কিম্বা চিতা যাই বল (এদের মধ্যে আমি ত কিছু প্রভেদ দেখিনে, যদিও অনেকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন) মস্ত একটা বেতবনে ঘন ঝোপে কোণঠাসা হয়ে আটকা পড়েছিল। পালাবার পথ তার একটা মাত্র ছিল, তাও আবার খালের ধারে। হেঁটো ধুতির মতো কম চওড়া একটা খুস্কি পথ[১০]। আমি এরই পাশে টুল নিয়ে লুকিয়ে তার আবির্ভাবের আশায় বসেছিলাম। শিকারীরা চারিদিক হতে বন ঘেরাও করে পিটাতে পিটাতে আসছিল। আমি একান্ত উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম। তখন আমার অবস্থা, 'পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপযানং।'[১১] কিন্তু কই কারো দেখা নেই, আর আমাকে এড়িয়ে সে পথ দিয়ে কেউ যে পালিয়ে যাবে তারও কোন উপায় ছিল না। শুধু একটাবার জলে ভারী কিছু পড়বার ক্ষীণ একটা শব্দ আমার শ্রুতিগোচর হয়েছিল। কিন্তু সে এমন অস্পষ্ট যে তাতে করে অমন প্রকান্ড জানোয়ার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে এ কথা মনে করবার কোন কারণ ঘটেনি। আর সে শব্দ এতই ক্ষীণ যে কিছুতেই ভাবতে পারিনি, সে অরণ্য সম্রাট শার্দূল প্রাণরক্ষা করবার জন্যে নদীতে শেষ সন্তরণে প্রবৃত্ত। নৈরাশ্য আর বিস্ময় যুগপৎ আমার মনকে অধিকার করলে। হঠাৎ প্রহরী একজন চীৎকার করে উঠল। অন্য শিকারীদের নিয়ে সেই শব্দ অনুসরণ করে গিয়ে দেখি ব্যাঘ্র সন্তর্পণে জলে ঝাঁপিয়ে নিঃশব্দে সাঁতার দিয়ে ওপারে পৌঁছে চুপিচুপি পলায়নের চেষ্টায় আছে। শিকারীর চীৎকারে বাধা পেয়ে সবে থমকে দাঁড়িয়েছে।

এখনও দেখা যায় বাঘ ১২০ হাত চওড়া খরস্রোতা নদী সোজা সাঁতার দিয়ে পার হয়ে গিয়েছে। নদীর কিনারা পর্যন্ত তার পায়ের দাগ ছিল, তারপর ধারে ধারে অনেক দূর সাবধানে হেঁটে গেছে। নিরাপদ পার ঘাট বেছে নিয়ে তবে জলে নেমেছে। সাঁতরে অন্যপারে যেখানে একটি গাছ জলের উপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, সেইখানে কঠিন মাটি পেলে ডাঙায় উঠা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে তা সে ঠিক অনুমান করে নিয়েছিল। যদিও সোজা সেখানটিতে পৌঁছবার জন্যে স্রোতের মুখে সাঁতার দিতে বিশেষ কষ্টই হয়, তবুও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। প্রাণপণ চেষ্টায় আপন অভীষ্ট সাধন করে নিয়েছিল। এইসব নদীকে সর্বত্র সবর্দা বিশ্বাস করা চলে না। তবুও হিতোপদেশের ঐতিহাসিক বাঘের চেয়ে আমি যার কথা বলছি তার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল। তাকে আর পথচলা পথিকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়নি। অন্য একটা বাঘ আর একবার সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে গিয়ে জেলের জালে আটকা পড়ে

বেঘোরে মারা যায়। পরদিন তার মৃতদেহটা জেলেরা আমাদের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। এরা কই, মাগুর ধরবে বলেই জাল পেতেছিল, কিন্তু এমন নতুন শিকার পেয়ে তারা ভারি খুশি হয়, লাভও করেনি মন্দ! তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমাদের বাড়ির উদরে যে বিল আছে, চওড়ায় এক মাইলের উপরে হবে। যথাকালে এখানে হাঁস, চখাচখি আর স্নাইপের মস্ত মেলা বসে যায়। কথায় বলে, 'গাঁ দেখবি ত কলম, আর বিল দেখবি ত চলন!' এ বিল সেই বিখ্যাত চলন বিলের শাখা। এরই ধারে জলাভূমিতে বছর কুড়ি আগে বুনো মোষের দল চড়ে বেড়াত। একবার দুর্গা পূজার সময় (তখন আমরা ছেলেমানুষ) নবমী পূজার দিন, ব্রাহ্মণ ভোজনের দিন, দই-ক্ষীর আর এসে পৌঁছয় না। ফলারে বামুন পাট পেতে বসে গেছেন, কর্তারা ঘরবার করছেন। এদিকে যেখান দিয়ে নৌকা করে গয়লারা দই-ক্ষীর নিয়ে আসবে, একপাল বুনো মোষ সেখানটিতে পথ আটক করে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়ি মাঝির সাধ্য কি যে নৌকা বেয়ে আসে! এ মোষের পাল তো সুবোধ বালকের দল নয় যে তাদের বুঝিয়ে পড়িয়ে কিছু সুবিধা হবে। তাই যতক্ষণ এই মহিষাসুরগুলি আপনা হতে পথ ছেড়ে না দিলে, ততক্ষণ মহিষমর্দিনীকে ভোগের জন্যে মুখটি বুজে প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়েছিল। এখন আর সে জলাভূমি নেই। বিলগুলি মাঠ হয়ে তাতে চাষবাস চলছে। মহিষাসুরও তার মোসাহেবের দল নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে।

পাহাড়তলীর বনজঙ্গল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য গ্রীষ্মে বাঘেরা প্রায়ই নালায় গিয়ে পড়ে থাকেন, তবে ভিন্ন কারণে (মানুষে যে কারণে নালায় আশ্রয় গ্রহণ করে, এখানে তা নয়)। আমরা যেমন গরমের দিনে নাইতে নামলে আর উঠতে চাইনে, তেমনি আর কি।